ভারতীয়ত্ব

২১ শতক ভারতবর্ষেরই—এটাই সত্যি

পভন কে ভার্মা

ভাষান্তর
বিশ্বজিত সেন

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	৯
বিষয়-প্রবেশ	১১
ক্ষমতা : গণতন্ত্রের অপ্রত্যাশিত জয়	২৫
বৈভব : 'অন্য পৃথিবী'বাদের লোকশ্রুতি	৬২
প্রযুক্তি : অতীতের প্রচ্ছায়ায় সমৃদ্ধি	১০০
আ-ভারতীয়তা : হিংসাশ্রয়িতা ও অভিযোজন-সামর্থ্য	১৩৯
পরিশিষ্ট : উড্ডয়ন কল্পনা ও একটি সঙিন ভারসাম্য	১৭৯
পাদটীকা	১৯৯
নির্ঘণ্ট	২০৯
পাঠবস্তু-র সত্ত্ব : ঋণ স্বীকার	২২২

মুখবন্ধ

হরিদ্বারে গঙ্গা নেমে আসে হিমালয় থেকে ও সমতলভূমিতে প্রবেশ করে। তারপর সমুদ্র অভিমুখে তার দীর্ঘ যাত্রাপথ। এই শহরটি হিন্দুদের কাছে পবিত্র। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী প্রত্যহ এই শহরে আসেন। দয়া ও প্রার্থনার ব্যস্ততার মধ্যে কয়েকজন মানুষকে দেখা যায়, যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম গভীর কিন্তু বরফশীতল জলে এক পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন চরম শীতেও। তাঁদের হাতে একটি পারদর্শী কাচের টুকরো। এই কাচের টুকরোটির মাধ্যমে তাঁরা সারাদিন দ্রুত বহমান জলধারার ওপর নজর রাখেন। তাঁদের চোখের পলক পড়ে না, এবং তাঁদের মনঃসংযোগ আশপাশের ভক্তদের তুলনায় অনেক অধিক। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ভিন্ন : প্রার্থনা, মোক্ষ বা পরলোকগত আত্মার নির্বাণ নয়। তাঁদের দৃষ্টি নদীর নীচে পড়ে থাকা পয়সাগুলির দিকে, যাদের অবস্থান তাঁরা শনাক্ত করেন ও দক্ষতাসহযোগে পায়ের দ্বারা বার করে আনেন।

ভারতের চরিত্র নির্ণয় করা একটি দুরূহ কাজ। ভারতীয়দের খুব সহজে পরিভাষিত করা যায় না, বিশেষত যখন তারা উত্তীর্ণ হওয়ার পথে। ইতিহাসের ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ঝলমলে বিশ্বায়িত পৃথিবীর মুখোমুখি তারা। বাস্তবে আমরা কারা, তা বোঝবার একটি চেষ্টা এই বইটি। এই চেষ্টায় সন্দর্ভ হিসেবে রাখা হয়েছে অতীতকে ও চৌহদ্দি হিসেবে ধরা হয়েছে ভবিষ্যৎকে। কাজটি কিন্তু বিপদসঙ্কুল, কারণ ভারত বিশাল এবং বহুবিধ। সে কখনোই নিজেকে এমন একটি পরিচয় দ্বারা আচ্ছাদিত করবে না, যার অন্তর্ভুক্ত সব কিছু। প্রতিটি সাধারণীকরণ পিছু একটি করে এমন ব্যতিক্রম আছে, যা নজর কাড়ে। প্রতিটি সাদৃশ্যপিছু একটি করে গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদ আছে। অতএব, যদি এই বইয়ের কোনো কিছু কাউকে আহত করে বা নিজের সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিপরীত হয়, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য, যতটা সম্ভব সততাপূর্ণ একটি ছবি তুলে ধরা কিন্তু আমি এও স্বীকার করছি যে সত্য কখনোই সার্বিক হয় না এবং এমন কিছু ব্যতিক্রম থাকতেই হয়, যার দিকে নজর দেওয়া জরুরি। আমি এও উল্লেখ করছি যে কোথাও কোথাও 'হিন্দু' এবং 'ভারতীয়' এই দুটি শব্দকে একে অন্যের পরিবর্তে ব্যবহার করেছি। এর পেছনে জাতিগর্ব নেই বরং এর কারণ এই যে অধিকাংশ ভারতীয়ই হিন্দু। এমন লক্ষণও অবশ্যই আছে যাকে সংশয়ের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে 'ভারতীয়' বলা যায়, এবং যা সব ভারতীয়র ওপরেই প্রযোজ্য, সে তাঁর ধার্মিক বিশ্বাস যাই হোক না কেন।

ভারত একটি উড্ডয়নের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু 'ভালো বোধ করুন' তরঙ্গ-জনিত

উন্মাদনার অন্যপারে গিয়ে এর কারণ খুঁজতে হবে। একটি জনসমষ্টির বিশ্লেষণ, যে হাজার হাজার বছর ধরে ইতিহাসের গালাইপাত্র হিসেবে অস্তিত্বে আছে, কখনোই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বা ধপধপে সাদা হতে পারে না। সব কিছু ঠিক হতে পারে না, আবার সব কিছু ভুলও হতে পারে না। জনতার ভিত্তিপ্রস্তর থেকে উদ্ভূত শক্তিকে নজরে রেখে একটি জমা-খরচের হিসেব তৈরি করতে হবে, চ্যালেঞ্জ এটাই। এই তর্কটিকেও প্রবন্ধায়িত করতে হবে যে প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট দুর্বলতাগুলি সত্ত্বেও শক্তিরই জয় হবে। সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সমাজের কাঠামো এই জমা-খরচের হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় উপস্থিত। তৎসহ জনতার সহজাত সহ্যশক্তি এবং তাদের উচ্চাশা ও ঐকান্তিক আগ্রহ। এই বিশেষ প্রসঙ্গে আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে এইগুলি : বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হওয়ার যে প্রতিভা আছে তাঁদের, দুর্বলতাকে ক্ষমতায় পরিবর্তিত করার যে ক্ষমতা আছে তাঁদের, এবং অবশ্যই ভাগ্য।

এই বইটিকে উপলক্ষ করে গবেষণা বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছে, কিন্তু যখন আমি সাইপ্রাসে কূটনৈতিক দায়িত্বে ছিলাম, তখনই এর বহুলাংশ লেখা হয়। এই অপরূপ দ্বীপটি আমাকে সেই পরিপার্শ্ব ও দূরত্ব উপহার দেয়, যার দরুন আমি আমার হৃদয়ের খুবই কাছের বিষয় নিয়ে এই বইটি লিখে উঠতে পারি। আমি ডেভিড দাভিদারের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, যিনি কানাডা-র পেঙ্গুইনে আছেন এবং প্রথম আমাকে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করেন। আমি কৃতজ্ঞ 'পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া'-র রবি সিং, ভি.কে. কার্থিকা ও নন্দিনী মেহতার কাছে, যাঁরা অত্যন্ত দক্ষতাসহ পাণ্ডুলিপিটির সম্পাদনা করেন। আমি মালিনী সুদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, কারণ কৃতি-বৃত্তান্তগুলি সম্পূর্ণ করা নিয়ে তাঁকে প্রচুর বিরক্ত করেছি। আমার পরিবারের সদস্যরা আমার লেখালেখিতে নিবিষ্ট থাকাকে নির্বিকারভাবে মেনে নিয়েছেন। আমার পরলোকগতা মা, ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে যাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল, সদৈব অনুসন্ধান দিতে উদগ্রীব থাকতেন। আমার পুত্র বেদান্ত, আমার কন্যা মানবী ও বাতাসা, এঁরা সর্বদাই গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁদের বন্ধুরাও, যাঁদের মধ্যে ঋতভ্ প্যাটেলের নাম উল্লেখযোগ্য। সর্বদার মতোই, আমি আমার সহধর্মিণী রেণুকার কাছেও কৃতজ্ঞ, যিনি ধৈর্য ও মানসিক সমর্থন প্রদান করেছেন। তিনি বইটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর মতামতও দিয়েছেন।

বিষয়-প্রবেশ

ভারতীয় হওয়ার অর্থ কী—এই প্রশ্নটির সুগভীরে একটি নতুন এবং অন্যতর অনুসন্ধান, এই বইটির উদ্দেশ্য। বিশ্বপর্যায়ে এবং ভারতের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই—এই অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতাকে আজ আর অস্বীকার করা যাবে না। একবিংশ শতাব্দীতে দেখা যাবে পৃথিবীর প্রতিটি ষষ্ঠ মানুষ একজন ভারতীয়। ভারত হয়ে উঠবে পৃথিবীর বৃহত্তম উপভোক্তা বিপণি, ভারতের ক্রয়েচ্ছু মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা গিয়ে পৌঁছোবে অর্ধ-বিলিয়নে। এমনিতেই, ক্রয়ক্ষমতার সাম্যের দিক থেকে—ভারতের অর্থতন্ত্র আজ বিশ্বে চতুর্থ স্থানের অধিকারী। মোট রাষ্ট্রীয় উৎপাদনের দিকে যদি নজর দেন—তা হলে ভারত পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের একটি। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্নও বটে। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাষ্ট্রসংঘের সুরক্ষা পরিষদে স্থায়ী আসন পাওয়ার অধিকার তার আছে।

এগুলি ছাড়াও, একটি অর্থবহ রদবদলের ঝোড়ো হাওয়া বইছে গোটা উপমহাদেশটি জুড়ে। ফ্রান্সের জনসংখ্যার চাইতেও বেশি স্নাতক আছে ভারতে এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত অর্জন করেছে নতুন পরিচিতি। আর কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতের সফটওয়্যার রপ্তানি ছাড়িয়ে যাবে আমেরিকান ৫০ বিলিয়ন ডলারের সীমারেখা। চিনের পর, ভারতীয় ডায়াসপোরা আজ বৃহত্তম গোটা পৃথিবীতে। আমেরিকায় ভারতীয়রা উঠে এসেছেন সর্বাধিক সমৃদ্ধ জনসমষ্টি হিসেবে। ব্রিটেন এবং গালফ-এর দেশগুলিতে তাঁদের ক্রমবর্ধমান ধনসম্পন্ন উপস্থিতি! বিশ্বের মনঃপূত হোক বা না হোক, নতুন মিলেনিয়ামে ভারতীয়দের সঙ্গে কোথাও না কোথাও মুখোমুখি না হওয়া অসম্ভব। পূর্বের চাইতেও সৎ ও স্বচ্ছভাবে এটা বোঝা জরুরি যে 'ভারতীয় হওয়া' বলতে কী বোঝায়!

অতীতেও এই জাতীয় অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে, তবে তা নিষ্ফল হয়েছে দুটি কারণে। প্রথম কারণটি হল—বিদেশিদের চোখে ভারতের একটি বিশেষ ছাঁচে ঢালাই হওয়া। দ্বিতীয় কারণ—নিজেদের ভাবমূর্তি যা ভারতীয়রা তুলে ধরতে চান। বিদেশিরা সচরাচর ভারতে এসে হাঁ করে থাকেন বা গোগ্রাসে গেলেন। দেখা এবং শোনা অভিজ্ঞতাগুলো তাঁদের অভিভূত করে। এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ অজস্র দেওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের ঈষৎ উন্মাদনাপূর্ণ বয়ানগুলির মধ্যে একটির উল্লেখই যথেষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতভ্রমণের পর মার্ক টোয়েন লেখেন—'সত্যি, এই-ই ভারত! স্বপ্ন ও রোমান্টিকতার দেশ, অপ্রতিম বৈভব ও অকল্পনীয় দারিদ্র্যের দেশ! ভূতপ্রেত, দৈত্য ও আলাদিনের প্রদীপের দেশ, বাঘ ও হাতির দেশ—শতাধিক রাষ্ট্রের

দেশ, শতাধিক ভাষার দেশ, এক হাজার ধর্ম ও দু লক্ষ দেবতার দেশ, মনুষ্যজাতির শৈশবকালীন দোলা, মনুষ্যভাষার জন্মস্থল, ইতিহাসের মাতৃস্বরূপা, কিংবদন্তির পিতামহীস্বরূপা, ঐতিহ্যের প্রপিতামহীস্বরূপা...'।[১]

ঔপনিবেশিক পর্বে, এডওয়ার্ড সঈদ যাকে পশ্চিমের 'প্রাচ্যবাদ' বলেছেন, তার হাতে পড়েও ধ্যানধারণাগুলির দুর্দশা ঘটে। প্রাচ্য ছিল অজ্ঞাত 'অপর', তার মানুষজন সুপরিচিত 'আমাদের' বিরুদ্ধে অপরিচিত 'ওরা'। অধিকাংশ ইংরেজের মনে ভারত উদ্রেক করত মোটাদাগের 'উল্লাস' অথবা 'ভর্ৎসনা'-র। এই দেশটিকে নানাভাবে দেখা হত, যেমন মেরামতের অযোগ্য এমনভাবে ভাঙাচোরা কিংবা আধ্যাত্মিক স্তরে উত্তীর্ণ, একেবারেই শাসনের অযোগ্য কিংবা নিপাট ভালোমানুষিতে ভরপুর এবং স্বনির্ভর, এমন অনৈতিক যার নিরাময় দুরূহ কিংবা শান্তিময় অপার্থিব, অসম্ভবরকম ধোঁয়াটে কিংবা আশ্চর্যজনক সুপ্রাচীন যা নিজেকে উন্মোচিত করে। এই পরিভাষাগুলিকে অনুসরণ করে—ভারতীয়রা অকথ্য রকম অলস বা বিস্ময়কর পরিশ্রমী, প্রচণ্ড অন্ধবিশ্বাসী বা উল্লেখযোগ্যভাবে বিবর্তিত, ন্যক্কারজনক রকম পা চাটা বা সদাসর্বদা বিদ্রোহী, দেখে চমকে যেতে হয় এমন প্রতিভাবান বা এপার-ওপার দেখা যায় এমন নকলনবিশ, মহান সংস্কৃতিমান বা দেখলে দয়ার্দ্র হতে হয় এমন গরিব এবং মূলত এরকমই আরও অনেক কিছু। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইংরেজের পাণ্ডিত্য প্রশংসাযোগ্য, যেমন প্রকৃতি-বর্ণনা বা গেজেটিয়ার রচনা। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রগুলিকে প্রায় সময়েই টেনেহিঁচড়ে 'সাধারণীকরণে'র দিকে নিয়ে যাওয়া হত, যাকে গবেষণা সমর্থন করে না। জর্মন সংস্কৃতবিশেষজ্ঞ—ম্যাক্সমুলার, যিনি হিন্দুদর্শনের অধ্যয়নে একটি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেছেন, অতীব আবেগপূর্ণ তর্ক উপস্থাপিত করেন যে ভারতীয়রা অত্যন্ত সৎ-ও বটে![২]

স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্ব, সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ও ইংরেজকে পরাভূত করার জন্য 'অহিংসা'র নির্বাচন ভারতীয়দের একটি নতুন ভাবমূর্তির জন্ম দেয় যা ছিল এক অহিংস ও সহনশীল জাতির। ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে জওহরলাল নেহরুর দীর্ঘ শাসনকাল আর-একটি কল্পনার জন্ম দেয়—লক্ষ লক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতীয়, পরম্পরা থেকে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংঘর্ষে লিপ্ত! এত সত্ত্বেও ভারতভূমি-র বৈচিত্র ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জটিলতা একটি যথার্থ এবং নির্ভুল বোধের পথে বাধা সৃষ্টি করতেই থাকে। ভারতে বসবাসকারী প্রতিথযশা অর্থনীতিবিদ জন কেনেথ গ্যালব্রেথ, যিনি জওহরলাল নেহরুর বন্ধুও ছিলেন, ভারতের বর্ণনা দেন 'কার্যরত নৈরাজ্য' .... এইভাবে। কয়েক দশক পরে তিনিই অবশ্য বলেন যে ওই মন্তব্যটি করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।[৩]

১৯৯১ সালে অর্থতন্ত্রে সংশোধন ও ১৯৯৮ সালে পরমাণুশস্ত্রের বিস্ফোরণ—এই দুটি ঘটনার দরুন পশ্চিমের অর্থনৈতিক বিশ্লেষক ও রাজনৈতিক রণকুশলীদের রাডার পর্দায় 'ভারত' নামক বিন্দুটির আকার একটু বড়ো হয়। 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা ভারতের সঙ্গে

সদ্যোত্থিত হস্তীর তুলনা দেয়, যে 'বাজার'-এর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। স্টিফেন পি. কোহেন ভালোরকম দলিলপত্র জোগাড় করে একটি লেখা লেখেন যাতে তিনি সংশয় প্রকাশ করেন যে ভারত কি সত্যিই কোনওদিন মহাশক্তিধর হয়ে উঠবে নাকি চিরকাল 'যাত্রাপথেই' রয়ে যাবে। কিন্তু এই অস্তিত্ববাদীসুলভ সংশয় সেই পর্যটকদের চিন্তাভাবনায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করতে সক্ষম হয় না, যাঁদের 'পাণ্ডিত্য' স্বল্প এবং যাঁদের ভারতদর্শনে আসার সংখ্যাগত দিকটি পর্যটন-বিভাগের মনঃপূত হওয়ার মতো নয়। তাঁরা একটি প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কার করতে আসেন যার অত্যাশ্চর্য নিদর্শনগুলি অযত্নসহ গোটা দেশে ছড়ানো-ছেটানো রয়েছে। তাঁরা আধ্যাত্মিক ভারতের বিষয়ে পড়েছেন এবং তাকে দক্ষিণ ভারতের সুউচ্চ মন্দিরচূড়াগুলিতে বা বেনারসের গঙ্গায় স্নানরত পুণ্যার্থীদের মধ্যে দেখতে পান। খাদ্যবস্তু এবং সাজপোশাকের বৈচিত্র তাঁদের ক্যামেরার রিলগুলিকে গিলে ফেলতে থাকে। অবিশ্বাস্য 'স্বাদেশিকতা'র নিদর্শন হিসেবে সস্তার হস্তশিল্প ক্রয় করেন তাঁরা। ইংরেজিতে বাক্যালাপরত ভারতীয়দের মধ্যে এবং মহানগরের বহুতলভবনগুলিতে তাঁরা আবিষ্কার করেন 'আধুনিক ভারত'কে। তাঁদের চোখে ধুলো দেয় যে দালাল, সে পশ্চাৎপদ অর্থতন্ত্রের অপরিহার্য অনৈতিকতার প্রতীক। দারিদ্র্য এবং ক্লিন্নতা, বিবমিষার উদ্রেক করলেও ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাবে তার ভেতরেই চোখে পড়ে আধ্যাত্মিক ভারতের সময়সীমাবিহীন অনন্যতা। কিছুক্ষণ তর্ক চলে—অহিংসায় বিশ্বাসী একটি জাতি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় কীভাবে? পর্যটকেরা ঘরে ফেরেন, এই ভেবে বিস্মিত হন যে এত বিশাল একটি দেশ একসূত্রে বাঁধা রয়েছে কেমন করে ও দেশের দরিদ্র এবং অর্ধউলঙ্গ জনসমুদায় এতদিন ধরে গণতন্ত্রের সপক্ষে ভোট দিচ্ছে কেন?

এর মধ্যে একটি ধারণাকেও ভুল বলা যাবে না। ভারতের বাস্তবতা যুগপৎ পারদর্শী এবং ধোঁয়াটে। যা চোখে পড়ছে তা সেই বাস্তবেরই অংশমাত্র, যার অনেকটাই চোখে পড়ে না। বিদেশিদের চোখে প্রকট ব্যাপারগুলিই ধরা পড়ে, যাদের তাঁরা 'মহান ভারতীয় সভ্যতা'র বিষয়ে তাঁদের আগে থাকতে তৈরি রাখা ধারণাগুলির সঙ্গে মিশ খাইয়ে নেন। এর ফলে অনেকগুলি ধ্যানধারণা, খুঁটিনাটি বিচারের হাত থেকে ফসকে যায় ও বহু নিষ্কর্ষ হয় সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়, নচেৎ আংশিকভাবে সত্য। বিদেশিদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করা যায়। কিন্তু এ কথা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বছরের পর বছর ধরে ভারতীয়রা, শিক্ষিত ভারতীয় ও ভারতীয় নেতৃত্ব, সজ্ঞানে ভারতের একটি ভাবমূর্তি এগিয়ে দিয়েছেন ও তাকে ফাঁপিয়েছেন। ভাবমূর্তিটি মিথ্যা এবং এ সত্য তাঁদেরও অজানা নয়। সদিচ্ছাসম্পন্ন ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিদেশি পর্যটক ও পণ্ডিতদের তাঁরা প্ররোচিত করেছেন এই ভাবমূর্তিটি হজম করতে। যেটা এর চেয়েও বদখত ব্যাপার, তা হল যে তাঁরা এই ভাবমূর্তিটির প্রেমে নিমজ্জিত এবং এখন আর এটুকুও স্বীকার করতে সক্ষম নন যে ভাবমূর্তিটি মিথ্যা।

একটি কোয়ান্টাম উল্লম্ফন এই ভাবমূর্তিটিকে সৃষ্টি করেছে অথবা চিন্তাধারার হাতসাফাই, যা একটি অকাট্য 'আছে' থেকে ভঙ্গুর 'হতে পারত'কে গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র ক্রিয়াশীল, অতএব ভারতীয়দের গণতন্ত্রপ্রেমী প্রকৃতি সন্দেহের ঊর্ধ্বে! অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের জন্ম ও বাড়বাড়ন্ত এখানেই ঘটেছে, অতএব ভারতীয়দের অধ্যাত্ম-প্রবণতা সন্দেহের ঊর্ধ্বে! বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ এখানে ঠাঁই পেয়েছে, অতএব ভারতীয়দের স্বভাব সহনশীল। অহিংসার ওপর নির্ভর করে মহাত্মা গান্ধি ইংরেজদের পরাভূত করেছিলেন, অতএব ভারতীয়রা স্বভাবগতভাবে অহিংস ও শান্তিপ্রেমী। হিন্দুদর্শন বলে বস্তুজগৎ পরিবর্তনশীল ও তাৎক্ষণিক, অতএব হিন্দুরা অন্য পৃথিবীতে বিশ্বাসী ও চিন্তাগত দিক দিয়ে বস্তুবাদী নয়। ভারত বিভিন্নতাকে প্রশ্রয় দিয়েছে অতএব ভারতীয়রা বহুত্ববাদী ও উদার মনোভাবাপন্ন।

আজ ভারত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং আগামী দশকগুলিতে এর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলি আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে। তাকে আর সাদাসিধে কিংবদন্তিবিক্রেতার ভূমিকায় সীমিত রাখা যাবে না। ১৯৪৭ সালে এই ভূমিকাটি তবু মানানসই ছিল। দিগন্তে আগস্ট মাসের মেঘপুঞ্জ যেমন সর্বদাই ভয় দেখাতে থাকে, তেমনই সকলের মনে একটা সংশয় ছিল যে সদ্যস্বাধীন দেশটি আদৌ বেঁচেবর্তে থাকবে কিনা। রাজনীতি ছিল পলকা। দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। দেশের একতাকে স্থায়িত্বের ছাড়পত্র দেওয়া যাচ্ছিল না। এমন একটি পরিস্থিতিতে, যে কোনো রাষ্ট্রই কিংবদন্তি নিয়ে একটু-আধটু নাড়াচাড়া করতে বাধ্য। কারণ, জনতাকে একসূত্রে বেঁধে রাখা প্রয়োজন। সেই সময়ে ভারতের পক্ষে এই প্রয়োজনটি ছিল সর্বাধিক। কিন্তু স্খলিত হতে থাকা রাজনীতির প্রয়োজন থেকে ক্রমশ এ হয়ে উঠল একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের সচেতন এবং দীর্ঘস্থায়ী চাতুর্য। প্রতিটি কিংবদন্তির গভীরেই সত্যের কয়েকটি কণা সন্নিহিত থাকে, তাই সতর্ক পর্যবেক্ষকের একটু সময় লেগে যায় নকশা ও কাপড়ের মাঝখানের ফাঁকটুকু ধরতে। ভাবমূর্তি নির্মাণই যাঁদের পেশা, তাঁদের ভানগুলোকে কেবল সমালোচনা করার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ব্যাপারটা। আজ এটা বোঝা জরুরি যে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটানো বিকৃতিগুলি কোথায় কোথায় ভারতের ক্ষতিসাধন করেছে ও করছে। এরকম জায়গা দুটি—এক, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলোকে নজরে রেখে যেখানে ভারতের যথার্থ ক্ষমতা ও প্রতিভাকে চিহ্নিত করার জন্য আবশ্যক নীতি ও কর্মসূচিগুলিকে বাছাই করার কাজ চলছে এবং দুই—ভারত ও ভারতের জনতার যথার্থ মূল্যায়নকে তুলে ধরার কাজটি, যা বিশ্বসম্প্রদায়কে উভয়ের সঙ্গেই আরও বেশি করে সংলিপ্ত করবে।

অতীতের মিথ্যাগুলিকে ভেঙে ফেলার জন্য সাহসের প্রয়োজন আছে—কেন-না এর অর্থ রাষ্ট্রের গোঁড়ামিগুলোর ওপর প্রশ্নবাচক চিহ্ন আরোপ করা। কিন্তু অনেক কিছুই এর ওপর নির্ভরশীল, কাজে কাজেই কাজটিকে গতানুগতিক বা ঢিলেঢালা ভাবে নেওয়া

উচিত নয়। পরিস্থিতির দাবি একটি বৌদ্ধিক রসায়নের, যা আমাদের ভানের দুনিয়ায় প্রচলিত নিরেট হাবভাবগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। যা আমাদের উৎপ্রেরিত করে যাতে আমরা কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন শুধোই। ভারতের 'বিশিষ্ট' শ্রেণি যার পেছনে ৫০০০ বছর পুরোনো এবং ক্রমানুক্রমিক মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে, অতীব সহজে ঔপনিবেশিকতা-কে মেনে নিল ও মেকালের আদর্শ সন্তান হয়ে উঠল—কেন? আমাদের অহিংস স্বভাবের জন্যই কি আমরা বারংবার আক্রান্ত হয়েছি? নাকি অধিক শক্তিধরের বশ্যতা মেনে নিতে ও তার সঙ্গে যোগসাজশ করতে আমরা চিরকাল উদ্‌গ্রীব? ভারতীয়রা ধনী ও শক্তিধরের সামনে নতমস্তক এবং দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন .... কেন?

আর্থসামাজিক ব্যবস্থার অসাম্য সত্ত্বেও ভারতে স্বাধীনতার জন্য বা তার পরবর্তী অধ্যায়ে সহিংস বিপ্লব হয়নি। এ কি আমাদের সহজাত অহিংস স্বভাবের পরিচায়ক না এর উত্তর অন্য কোথাও খোঁজা উচিত? একটি রাষ্ট্র, মহাত্মা গান্ধির পর্বতোপম ত্যাগ যার আদর্শ, এত দ্রুত এবং এমন অবিশ্বাস্য রকম নীতিভ্রষ্ট হয়ে উঠল—কীভাবে? আমরা কি সঠিক পথের সন্ধানে লক্ষ্যের অবমূল্যায়ন করি, নাকি কেবল ফলাফল নিয়েই মত্ত থাকি—সেখানে পৌঁছোবার পথ যেমনতরোই হোক না কেন।

হিন্দুরা তাঁদের সংখ্যাবহুল সমধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে 'অস্পৃশ্যতা' অবলম্বন করেন ও জাতিপ্রথার অঙ্গ হিসেবে পৃথিবীর সংকীর্ণতম বর্জনবাদে বিশ্বাসী। এ সত্ত্বেও কি তাঁদের সহনশীল বলে মেনে নিতে হবে? যদি তা না হয়, তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতে বেঁচে আছে কেমন করে? আমরা কীভাবে আশা করি যে তা ভবিষ্যতে সুদৃঢ় হবে? একটি জনসমুদায় যারা স্বাভাবিকভাবে উচ্চনীচ ও 'মর্যাদা' এবং অসাম্যে বিশ্বাসী, তাঁরা কি গণতন্ত্রপ্রেমী এই সম্বোধনের যোগ্য? আবার—যদি তা না হয় তা হলে ভারতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি জীবিত আছে কেমন করে? তা যে শুধু জীবিত আছে তাই নয় ফলন্ত ফুলন্তও বটে। একটি জনসমুদায়, যাঁরা গৃহভৃত্যকে ঠেঙিয়ে আধমরা করে ফেলেন, বিচারাধীন বন্দির চোখ উপড়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেন, মোটা যৌতুকের লোভে বউয়ের গায়ে আগুন দেন—তাঁদের কি মনোগতভাবে অহিংস বলা চলে? আবার—যদি তা না হয় তবে গান্ধিজির অহিংস নীতি রণকৌশল হিসেবে সফল হল কীভাবে? ভগৎ সিং ও সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী কর্মোদ্যমের সমর্থকই বা সংখ্যায় এত কম কেন?

মূল্যায়নের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রাথমিকভাবে সততা দাবি করে। একটি জাতি, যে ব্যবসায়ীকে 'মহাজন' সম্বোধন করে, যার অর্থ মহান ব্যক্তি, যে সর্বব্যাপী সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর পুজো করে, যে 'অর্থ' শব্দটি ঐহিক সুখসমৃদ্ধির দ্যোতক, তার পেছনে গোটা জীবন ধাওয়া করে, তাকেই আবার বিস্তারে আধ্যাত্মিক ও 'অন্য পৃথিবী'বাদী মনে করা হয়। আমরা বস্তুত, কোন অর্থে আধ্যাত্মিক? এই যে আধ্যাত্মিকতা, যাকে অহরহ আমাদের চোখের সামনে নাচানো হচ্ছে, আমাদের জীবনে তার ভূমিকাটাই বা কী? একটি দেশ,